ঔপন্যাসিকের বিবেক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

শিবনারায়ণ রায়

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

আজ সখেদে স্মরণ করি যে প্রথম যুগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে যিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত সব চাইতে মৌলিক ও প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। পরে জানতে পেরেছি বয়সের হিসেবে তিনি আমার চাইতে মাত্র বছর দেড়েকের ছোট ছিলেন; তাঁর প্রথম বই নয়নচারা এবং আমার প্রথম বই প্রেক্ষিত একই বছরে (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়; মুত্তবুদ্ধি সাহিত্যিক - সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা পত্রিকায় আমরা প্রায় একই সময়ে লিখেছি।দেশ বিভাগের আগে প্রথম যৌবনে কলকাতায় যাঁরা ছিলেন মানস - সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়প্রতিম তাঁদের ভিতরে কারো কারো সঙ্গে (যেমন কাজীআব্দুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) ঐ দশকেই বয়সের ব্যবধান পেরিয়ে আমারো বন্ধুতা গড়ে ওঠে। এমনকি সন তারিখের হিসেব মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারছি পারি যে কিছুকাল আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। তবু যে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি, তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে ঢাকায় কয়েক মাসের জন্য আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ না পেলে তাঁর অসামান্য শৈল্পিক অর্ন্তদৃষ্টির সন্ধান পেতে আমার যে হয়তো আরো বিলম্ব হত, এই ত্রুটি ও দুর্ভাগ্যের জন্য একান্তভাবে আমিই দায়ী।

আসলে আমি চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি সযত্নে আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের অনুশীলন করেছি। এবং বয়ঃপ্রাপ্তি কালেই নাস্তিক্য ও বিশ্বনাগরিকতা আমার প্রতিন্যাসে অনুস্যূত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আরো অনেক শিক্ষিত সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি হিন্দুর মতো আমিও বহুদিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে প্রায় অজ্ঞ ছিলাম। মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, কাজী আবদুল ওদুদ, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া সেকালে কোনো বাঙালি মুসলমানের রচনাবলির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিলনা। বই সংগ্রহ করে পড়ার ব্যাপারে আলি অলস দীর্ঘসূত্রী নয়, কিন্তু কায়কোবাদ, রেয়াজুদ্দীন মাশদাহী, ইসমাইল হোসেন শিবাজী, বেগম রোকেয়া হোসেন, ইমদাদুল হক, নূরন্নেচ্ছা খাতুন বিদ্যাবিনোদ, 'বুদ্ধির মুত্তি' আন্দোলনের নেতা আবুল হোসেন, আবুল ফজল প্রভৃতির রচনাবলি বাংলাদেশে যাবার আগে অন্তত আমি পড়িনি।সৈয়দ ওয়ালুউল্লাহ্-র নাম অবশ্য আমি শুনেছিলোম; সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্যোগে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' এবং উর্দু, ফরাসি ও ইংরেজি অনুবাদে প্রকীর্তিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' (১৯৪৯) আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল; কিন্তু ১৯৭৫ সালের দুর্যোগপিঙ্গল বাংলাদেশের বিদ্যুদ্গর্ভ প্রদোষে তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি না পড়া পর্যন্ত তাঁর মনশ্চক্ষুর অসামান্যতা আমাকে ব্যাবর্তিত করেনি।

সব মহৎ রচনার মতো 'চাঁদের অমাবস্যা'রও একটি সার্বকালিক ও সার্বজনীন গূঢ়ার্থ আছে, কিন্তু প্রথম পাঠেই আমার মনেহয়েছিল দরিদ্র, অনভিজ্ঞ, শুন্যস্বাস্থ্য, গ্রামবাসী, 'বয়োতীত' যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর কাহিনিতে বিশেষভাবে সমকালীন বাংলাদেশের আত্যন্তিক সংকটই যেন উদ্ভাসিত হয়েছে। অথচ কৌতূহলী হয়ে যাঁকেই প্রশ্ন করি তিনি বলেন 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি দুর্বোধ্য উপন্যাস, একটি লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবাসী হওয়ার ফলে দেশের বাস্তব অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞ এবং অনহিত, তাঁর অনাশ্রয় কল্পনা তৎকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের অনুচিকীর্ষু। কিন্তু এইসব অভিযোগ আমার কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য ঠেকেনি। প্রবাসী তুর্গেনিভ ও জয়েস অনুধ্যায়ী স্মৃতি ও কল্পনার সামর্থ্যে আপন আপন স্বদেশ ও স্বকালের মর্মে

াদ্ঘাটন করেছিলেন। সকলের না হোক কোনো কোনো শিল্পী ও ভাবুকের ক্ষেত্রে দূরত্ব অনুপ্রবেশের সহায়ক। মুজিবী শ াসনের সেই শেষ দিনগুলিতে বাংলাদেশের সদ্যোজাত গণতন্ত্র যখন সর্বনাশের দিকে দ্রুত ধাবমান, ব্যাপক অপচার, পৌনঃপুনিক অধ্যাদেশ বিক্ষুদ্ধ, সন্ত্রস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বর্তমানে বীতরাগ ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন,যখন আমার চেনাজানা ফৈজাতের ভয়ে অস্বভাবী মৌনে আত্রান্ত, তখন সেই দমবন্ধপরিবেশে ‘চাঁদের আমাবস্যা’ আমাকে সাহায্য করেছিল সমক ালীন বাংলাদেশী শিক্ষিতজনের দুরপনেয় অন্তর্দ্বন্দ্বকে বুঝতে, সঞ্চার করেছিল দ্বন্দ্ব - উত্তরণের সম্ভাবনায় ঝাস।
অথচ ‘চাঁদের আমাবস্যা’ কোনো অর্থেই রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে জানা যায় যে এটিরবেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্‌স্ পর্বত অঞ্চলে পাইন - ফার - এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্র ামে লেখা হয়। এটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ঢাকায় ১৯৬৪ সালে, অর্থাৎ আমি যখন এটি পড়ি তার নয় বছর আগে। কিন্তু ব াংলাদেশের সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শু হয়েছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই। তাছাড়া একি শুধু বাংলাদেশের ম ানুষদেরই সংকট? একই ধরনের অত্যয়, অন্তর্দায়, সন্ত্রাসজাত বিমূঢ়তা ও স্তোভের চেষ্টা, অক্ষমতার গ্লানি ও দায়িত্ববিমুখ আন্যত্রিকতার উৎকণ্ঠা কি ভারতে ইমার্‌জেন্সির সময়ে আমরা দেখিনি? অথবা পরোক্ষ সূত্রে এরই কথা কি আমরা শুনি না হ্বাইমার রিপাবলিকের পতনকালে রচিত সাহিত্যে, নাটসি - বিজিতফরাসি দেশের অস্তিতপক্ষে, রক্তপিচ্ছিল জাকার্তর মুহ্যমান মৌনে? আরেফ আলী বিশেষ স্থানকালের বিশেষ একজন মানুষ--- ‘কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম’, ‘দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মত একটুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না’, ‘কষ্টেসৃষ্টে নিকটে জেলা - শহরে গিয়ে আই - এ. পাস করেছে’, ‘বয়স বাইশ - তেইশ, কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীত ভাব’, গ্রাম্যস্কুলের শিক্ষক, গ্রামের বড় বাড়ির কর্তা দয়াশীল ও ধর্মপ্রাণ দাদাসাহেবের আশ্রয়ে সে - বাড়ির বাইরের ঘরে তার বসবাস, ম াইনে বাবদ যে - সামান্য টাকা পায় বুড়ি মায়ের হাতে দিয়ে আসে --- কিন্তু নিদ্যম, সহৃদয় ও ত্রিয়মাণ সাধারণ মানুষেরই প্রতিভূ। ওয়ালীউল্লাহ্-র মহত্ত্ব এইখানে যে সংকটাত্রান্ত আরেফ আলীর আর্ত অপহ্নুতির প্রয়াসকে তিনি যেমন দুর্লভ নিপুণতায় অপাবৃত করেছেন তেমনি পরিশেষে তার অনভিভবনীয়, অঘোষিত, প্রত্যাশারিক্ত, শঙ্কাদীর্ণ দায়িত্ববোধেৰ অন াদৃত প্রকাশকেও আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ঝাস্য করে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ সার্থক শিল্পী ও যথার্থ মানবতন্ত্রী।

।। দুই ।।

‘চাঁদের অমাবস্যা’র আখ্যানিক পরিণাহ মোটামুটি এই মতো

শীতের এক উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাতে আরেফ আলী শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শিক্ষকতা করা সত্ত্বেও তার মনে ‘জ্যোৎস্নারাতের প্রতি আকর্ষণ’ এখনো পর্যন্ত ‘অদমনীয়’। ত ার মনে হয় এত সৌন্দর্য অর্থহীন নয়, তা মহারহস্যের ইঙ্গিতবাহী, এইরকম রাতে ‘ঝিভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে’। কিন্তু এ সব ভাবনা সে গোপন রাখে, সে নিঃসঙ্গ , বন্ধুহীন। শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে ঘরে না ফিরে সে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার রূপ দেখে। সেই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে যে তার আশ্রয়দাতা আলফাজউদ্দিন চৌধুরী বা বড়বাড়ির দাদ াসাহেবের ছোট ভাই কাদের চৌধুরী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। কাদের ‘নিষ্কর্মা’, দিনের বেশির ভাগ সময় বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকে, কখনো বা সারাদিন পুকুর ধারে ছিপবড়শী নিয়ে কাটায়, কারো সঙ্গে মেশে না, হঠাৎ রেগে ওঠে, বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বউ - এর প্রতি উদাসীন, রাতে বেরিয়ে যায় এবং সকালে যখন ফেরে ‘তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি অলৌকিক তৃপ্তি - সন্তোষ - ভাব’। দাদাসাহেব তাঁর এই অদ্ভুত প্রকৃতির ভাইটিকে নিজের পরিবারে ও সমাজে গ্রহণীয় করবার জন্য রটিয়েছেন যে কাদের ‘দরবেশ মানুষ’, রাতে সে ‘বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। কথাটা তিনি নিজে ‘সম্পূর্ণভাবে ঝাস করেন, তা নয়’, তবে ঝাস করতে চান, অন্তত অন্যদের ঝাস করাতে চান, যদিও ছোট ভাইকে তিনিও আদৌ বোঝেন না।
জ্যোৎস্নালোকে কাদেরকে দেখে আরেফ কৌতূহলী হয়ে তাকে অনুসরণ করে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে বাঁশবন থেকে সে চাপা ভারি কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ভয় পেয়ে ‘হাততালি দিয়ে রাখ ালের মত গডাকা আওয়াজ করে ওঠে।’ পরক্ষণেই বাঁশবনে একটি মেয়েমানুষের সভয় চিৎকার এবং পাথরচাপা দেওয়া স্তব্ধতা - সাপের মুখে ঢোকা ব্যাঙের ডাক হঠাৎ থেমে যাওয়ার মতো। অবশদেহ আরেফ শুনতে পায় বাঁশবন থেকে কে

যেন সরে যাচ্ছে। মনে জোর করে এগিয়ে যেয়ে দেখে যে বাঁশঝাড়ের 'আলো - আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ, অর্ধ - উলঙ্গ, পায়ের কাছে এক ঝলক আলো'। বিভ্রান্ত অবস্থায় ঝাঁশঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে হঁ াটতে আবার সে হঠাৎ দেখে সামনে দাঁড়িয়ে কাদের। আরেফ 'কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই।' 'সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে শু করে।' সে বাইন ফেরার পর শেষ রাতে কাদের তার ঘরে আসে, প্রশ্ন করে, আরেফ বাঁশবনে কী করছিল, কেন সে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আরেফ উত্তর না দিয়ে পাথরের মতো দঁ াড়িয়ে থাকে। কাদের ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যায়।

রাতের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সারাদিন আরেফকে ভাবায়, অভিভূত করে রাখে। সে 'একটা গোলকধাঁধায় ঢুকেছে যার অ াকৃতি - পরিধি কিছুই জানে না, যার অর্থ সে বোঝে না।' নিজেকে সে বোঝাতে চেষ্টা করে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি যতই বীভৎস হোক, সে নিজে 'দর্শক মাত্র', এই দৃশ্যের 'পাপ - নৃশংসতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' কিন্তু রাতে কাদের অ াবার তার ঘরে আসে, 'যন্ত্রচালিতের মত' বিমূঢ় আরেফকে সঙ্গে নিয়ে যায়, বাঁশঝাড় থেকে মৃতদেহটি তুলে নদীর জলে ভ াসিয়ে দেবার কাজে আরেফকে সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করে। আরেফ কাদেরের অন্ধকার মুখে দেখতে পায় আরেফের প্রতি তার 'পরম ঘৃণার ভাব।' কাদের চলে যায়, আর তারপর থেকে শু হয় আরেফের নিজের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই।

আরেফ মনের অন্তঃস্থলে জানে কী ঘটেছে, কে খুনি, নিহত নারীর শব যে সে দেখেছে এবং সেই শব নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার কাজে খুনিকে সে যে যত অনিচ্ছাতেই হোক, যত বিমূঢ় দশাতেই হোক সহায়তা করেছে এ সত্য প্রকাশ্যে স্বীকার করা তার অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব, এ কথা প্রকাশ না করলে ঐ নারীর মৃত্যু অর্থহীন, এবং তার নিজের জীবনের শূন্যগর্ভতা অসহনীয়। অপরপক্ষে দাদাসাহেব এবং কর্তৃপক্ষের কাছে একথা বলবার অবশ্যম্ভাবী ফল কী তা নিয়েও তার মনে সন্দেহ নেই। দরিদ্র, নিরাশ্রয়, নির্বান্ধব মানুষ সে; তার আশ্রয় ঘুচবে, চাকরিটি যাবে, দয়ালু শক্তিমান আশ্রয়দাতা তার শত্রু হয়ে উঠবে, কর্তৃপক্ষ খুব সম্ভবত তার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না, তার আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীরা তার এই সত্যকথনের সমর্থন তো করবেই না, উলটে তার নির্বুদ্ধিতার নির্দয় সমালোচনা করবে, তার আচরণের পেছনে কোনো কুৎসিত কারণ খুঁজবে। আরেফ জানে সে 'ভীত, দুর্বলচিত্ত, অসহায় মানুষ'; এখানে অন্তত সে নিরাপত্তা, বাসস্থান ও যত কম মাইনের হে াক একটি চাকরি পেয়েছে'; দাদাসাহেবের 'স্নেহশীল ছাতার' নীচে থেকে সে তার 'জীবনে সর্বপ্রথম বেদনাদায়ক অভাব - অভিযোগটা যেন ভুলেছে,' মাকে মাইনের টাকা দেবার সময় জীবনে এই প্রথম সে সুখবোধ করছে।' অতএব আর পঁ াচজনের মতো আরেফ আলীও নানাভাবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, যে - ভয়ানক ঘটনা সে দেখেছে ভাবছে তা হয়তো আসলে এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন মাত্র, অথবা হয়তো কাদের সত্যিই দরবেশ এবং এই খুন সে করেনি, অথবা সংসারের অন্তহীন রহস্যের মতো এও এক রহস্য যার অর্থ তার অবোধ্য, অথবা হয়তো কাদেরের আচরণের পিছনে একটি 'স্বল্পভ াষী, গোপন স্বভাবের প্রেমিক মানুষের' প্রচণ্ড প্যাশন এবং আত্মকর্তৃত্বহীন দিশেহারা আকস্মিক ভয় কাজ করেছিল, অথবা সত্য প্রকাশের দ্বারা কারো উপকারের সম্ভাবনা নেই, বরং আশ্রয়দাতা দাদাসাহেবকে তার দ্বারা নিষ্ঠুর আঘাত করা হবে, কাদেরের চরম শাস্তি হতে পারে, এবং তার নিজেরও সমূহ সর্বনাশ ঘটবে। কিন্তু নিজেকে বিভিন্ন কাল্পনিক অথবা দিয়ে নান া ভাবে বুঝিয়েও সে না পারে সত্যকে চাপা দিতে, না পারে নিজের দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে যেতে। শীতকালের শান্ত নিস্তেজ নদীতে স্টিমারের উজ্জল সাদা সন্ধানী আলোয় মেয়েটির ফেঁপে ফুলে ওঠা বিবস্ত্র শব আবিষ্কৃত হয়; জানা যায় মেয়েটি ঐ গ্রামের করিম মাঝির বউ! কাদের নিজেই তার কাছে রাতের গোপনে দু-এক কথায় স্বীকার করে যে সে ভয় পেয়ে পারিবারিক সুনামের কথা ভেবে তার উপযাচিকাকে খুন করেছে এবং তার স্ফীত, রক্তবর্ণ, ঘূর্ণ্যমান চোখ দেখে অ ারেফের মনে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে 'কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝির বউ - এর প্রতি কোনো ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়।' কাদের আবার রাতে এসে তাকে, শাস্তির ভয় দেখায়। কোনো রকমের স্তোভ থেকেই আরেফ আলী শান্তি বা স্বস্তি পায় না। তাকে নিজের কাছে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় যে 'আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা' থেকেই তার এই অধ্যবসায়ী আত্মপ্রবঞ্চনার উদ্ভব; মানসিক দ্বন্দ্ব অসহ্য হওয়াতে সে স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, 'ভীতির নগ্ন চেহারা দেখে বিবেকের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়েছে,' কিন্তু যে মানুষ জীবিত থাকবার জন্য সত্যকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত এবং নিহত নারীটির জন্য যার মনে সমবেদনা বোধ পর্যন্ত নেই সে 'নামেই শুধু জীবিত।' আসলে তেমন মানুষ মৃত, তার জীবন 'ধার করা জীবন।'

অতএব আরেফ আলী শেষ পর্যন্ত দাদাসাহেবের কাছে সত্যকথাটি নিবেদন করে, তারপর 'বিসদৃশভাবে উঠে দাঁড়িয়ে' তার কাছে বিদায় নেয়। সে হাঁটতে শু করা মাত্র স্তম্ভিত বড়বাড়ি থেকে দাদাসাহেবের গুগম্ভীর ডাক আসে, ভীত আরেফ আলী ছুটতে শু করে। থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা পুলিশকে জানায়। কিন্তু পুলিশ কর্মচারীটি তাকে ধমকায়, বাঘাগলায় বলে 'চালাকি করতে চেয়েছিলেন', থুথু ছিটিয়ে, আবার বলে, 'কী, অপরাধ স্বীকার করতে রাজি আছেন,' তাকে ভয় দেখায়, 'আজগুবি কথা' না ছাড়লে আরেফের নিজেরই ক্ষতি হবে বলে সতর্ক করে, তাকে মনে করিয়ে দেয়ে তার বৃত্তান্তের পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই, সে নিজে কাউকে খুন করতে দেখেনি, কিন্তু যুবতীর লাশের পাশে তার উপস্থিতি কাদের স্বচক্ষে দেখেছে, পুলিশের এসব যুক্তিই আরেফ আগে থেকে জানে, তার কাজের 'কী পরিণাম হবে, কেন হবে, কী কী ভাবে হবে--- সেসব কথা উপলব্ধি করে তার ভীতির শেষ থাকে নাই।... তা এমনই একধরনের ভীতি যা শরীরে কোথাও গভীর ক্ষতের মতো লেগে আছে, তা উপড়ানো যায় না, অস্বীকার করাও যায় না।' তবু সেই নারীর প্রাণহীন দেহের স্মৃতি তাকে তাড়িত করেছে, সত্যকে স্বীকার না করে, দায়িত্ব পালন না করে, নিজের শাস্তি নিয়েও ঐ মৃত্যুকে নিরর্থতা থেকে রক্ষা না করে তার পক্ষে মানুষ হিসাবে বাঁচা সম্ভব নয়। পুলিশ কর্মচারীর ব্যঙ্গ, অবিশ্বাস, ভয় দেখানো তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তার 'গায়ের জীর্ণ আলোয়ানটি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অতিশয় জীর্ণ মনে হয়।'

আরেফ - এর অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিষ্ঠুর সত্য এবং প্রতিশ্রুতিরিক্ত দায়িত্ব - চেতনাকে এড়াবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা, সেই প্রয়াসেরব্যর্থতা, এবং ভয়ে, সংকোচে, অনিচ্ছায় তবু ভিতরকার তাগিদেই তার আশাহীন সততার প্রকাশ --- অসামান্য নিপুণতায় ধাপে ধাপে আরেফের আচরণ, কল্পনা, অনুভূতি এবং আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্ এ সব ফুটিয়ে তুলেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্-র শব্দ নির্বাচনে এবং বাক্যের গঠনে কিছু কিছু ত্রুটি পীড়া দেয়; জাতশিল্পী এবং নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও হয়তো দীর্ঘদিন জন্মভূমি থেকে দূরে থাকার ফলে তাঁর বাংলা শব্দের জ্ঞান যথেষ্ট শীলিত হবার সুযোগ পায়নি। শ্রুতিসুভগ ধবনি - বিন্যাসের চাইতে মানবীয় সংকটকে তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নির্বাচন করেছিলেন এবং সেই গভীর ও জটিল, ব্যক্তিক ও সঠিক বিষয়টিকে তিনি যেভাবে তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সুবেদী কল্পনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নিতান্ত দুর্লভ। অন্তত বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে যাঁরা স্বীকৃতভাবে প্রধান পূর্বসূরি - বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মানিক - তাঁদের উপন্যাসরাজিতে এই বিষয়টি এভাবে এত সার্থকতার সঙ্গে কোথাও পরিচিন্তিত ও পরিদৃশ্যমান হয়নি। ওয়ালীউল্লাহ্-র চেতনায় ডস্টয়েভস্কি, কাফ্কা, ফক্নার ও কাম্যুর প্রভাব পড়ে থাকাই সম্ভব, যদি পড়ে থাকে, সে প্রভাব তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিলেন; ফলে যে দর্পণটিতে আমরা আমাদের বিপন্ন, বিমূঢ়, সংকটাক্রান্ত, দ্বিধাদীর্ণ মুখ দেখে চমকে উঠি সে দর্পণ নৈর্ব্যক্তিক থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে একজন বিশেষ ব্যক্তি, বাইশ - তেইশ যার বয়স, যে ভিতরে অশান্তির জ্বালা নিয়ে 'ভক্তিমান শান্তচিত্ত ব্যক্তির মত নামাজ পড়ে', যে দরিদ্র, সন্ত্রস্ত, কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে ব্যঞ্জিত বিশ্বের নিভৃত আলাপ যার অশ্রুত নয়, যে নিঃসঙ্গ কিন্তু হৃদয়বান, নিজেকে নানাভাবে প্রতারণা করবার মতো কল্পনাশক্তির যে অধিকারী, কিন্তু দায়িত্ববোধও যার প্রবল এবং অনতিক্রম্য ভয় ও নৈরাশ্য নিয়েই যে সত্যের মুখোমুখি হতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম। আরেফের সংকটাক্রান্ত অস্তিত্বের যেটুকু তার চেতনায় এবং আমাদের নজরে প্রত্যক্ষ তার আড়ালে আরো অনেক দিকের ইঙ্গিত এই উপন্যাসে ছড়ানো আছে। আর আছে কিছু ছোট বড় চরিত্র, কেউবা দাদাসাহেব আর তার ভাই কাদেরের মতো জটিল এবং মোটা স দুরকম তুলির টানে আঁকা কেউবা আরবির মৌলবি অথবা দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি আমজাদ বা একচোখ কানা কর্কশ - কণ্ঠ মুয়াজ্জিনের মতো স্কেচ মাত্র। ক্যানভাস বড় নয়, বিষয়টি বড়, এবং সেই বড় বিষয়কে পরিদৃষ্ট করা হয়েছে অকম্প্য নিপুণতায়, গভীর অর্ন্তদৃষ্টির সামর্থ্যে, উদাত্ত কল্পনার স্বয়ম্ভরতায়। হয়তো ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবনদর্শন সমকালীন ফরাসি অস্তিত্ববাদীদের ভাবনাচিন্তা থেকে কিছু গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাঁর নিজস্বতা প্রশ্নাতীত। 'চাঁদের অমাবস্যা'র জগৎ একদিকে স্বয়ংসিদ্ধ; অন্যদিকে তা বিশিষ্টভাবে ব্যক্তিসাক্ষিক, বাংলাদেশি ও আমাদের আধুনাতম সংকটেও প্রাসঙ্গিক।

।। তিন ।।

এই উপন্যাসটি আমাকে এমনভাবে আপ্লুত করে যে আমি ওয়ালীউল্লাহ্র সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে পড়তে এবং তাঁর জীবন সম্পর্কে জানতে ব্যাকুল হয়ে উঠি। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি সহজে পাওয়া যায়নি; তাঁর অনেক লেখা এখনো গ্রন্থাকারে

অসংগৃহীত হয়ে পুরোনো পত্র - পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সম্প্রতিকালে সৈয়দ আবুল মকসুদ ওয়ালীউল্লাহ্-র অনেকগুলি গল্প, দুটি কবিতা, একটি প্রবন্ধ ও কিছু চিঠিপত্র তাঁর দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য' (১৯৮১,১৯৮৩) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে এটিই এখনো পর্যন্ত একমাত্র প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। এই বছরের গোড়ায় ঢাকায় থাকাকালে মকসুদ সাহেব তাঁর বইটি আমাকে উপহার দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে টুকিটাকি দুএকটি প্রবন্ধ ছাড়া ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো লেখার খোঁজ কেউ দিতে পারেননি। চট্টগ্রামে স্নেহভাজন অধ্যাপক মাহমুদ শাহ্ কোরেশির কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে পারি শহরের উপান্তে ওয়ালীউল্লাহ্র স্ত্রী অ্যান - মারি থিবোর সঙ্গে ১৯৭৫-এর মে মাসে আমার স্ত্রী গীতা ও আমি দেখাকরি। অ্যান মারি 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ করেছিলেন; এই তর্জমা ১৯৬১ সালে পারি থেকে L'arbra sans racine নামে প্রকাশিত হয়; কিছুটা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত দ্বিতীয় ফরাসি সংস্করণ বেরোয় ১৯৬৩ সালে 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদেও অ্যান - মারি সহায়তা করেছিলেন; এটি ১৯৬৭ সালে Tree Without Roots নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ হিসেবে অ্যান - মারির সঙ্গে কাইসার সায়েদ, জেফ্রি গিবিয়্যান ও মালিক খায়ম - এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

ওয়ালীউল্লাহ্-র জীবনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে অ্যান - মারি বিশেষ কিছু বলতে পারেননি। ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ দুই বছর অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেস - অ্যাটাশে পদে নিযুক্ত ছিলেন। অ্যান - মারিও ঐ সময়ে ফরাসি দূতাবাসে কাজ করতেন। পরিচয় থেকে ভালবাসা; ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে করাচিতে তাঁদের বিয়ে হয়। যদিও বিয়ের আগে অ্যান - মারি ধর্মান্তরিত হয়ে নাম নেন আজিজা মোসাম্মাদ নাসরিন এবং ইসলাম ধর্মমত অনুসারেই তাঁদের শাদি হয়, একমাত্র কাবিননামায় ছাড়া আর কোথাও তিনি এ নাম ব্যবহার করেননি। তাঁর কথা থেকে এবং ওয়ালীউল্লাহ্র রচনাদি থেকে সন্দেহ থাকে না যে অস্তিত্বের রহস্য বিষয়ে জাগ্রতচিত্ত কিন্তু যুক্তিবাদী ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো প্রচলিত বিশেষ ধর্মমতে আস্থাশীল ছিলেন না।

১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ্ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দূতাবাসে কাজ করেছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ইউনেস্কোতে চাকরি নেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের চাপে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর এই চাকরিটি যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শু হলে তিনি পারি শহরে বসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে পশ্চিমে জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগী হন। বাংলাদেশের সপক্ষে ১৯৭১ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় তাতে ওয়ালীউল্লাহ্কে বিশেষভাবে আমন্ত্রন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে তিনি আঁদ্রে মালরো এবং জাঁ - পল সার্ত্র্ -র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু উদ্বেগ অনিশ্চয়তা, মানসিক পরিশ্রম তাঁকে ভিতর থেকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর গভীর রাতের এই প্রতিভাবান শিল্পী উনষাট বছর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যান।

অ্যান - মারির সঙ্গে যখন আমরা দেখা করতে যাই তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বালকপুত্র ইরাজ। অ্যান - মারির কথা থেকে জানা গেল যে ফ্রান্সে ওয়ালীউল্লাহ্-র নিজের বিশেষ বন্ধুবান্ধব ছিল না; বিদগ্ধ, নির্লোভ, নায়কোচিত চরিত্র ও পসম্পন্ন এই মানুষটি গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না; বিস্তর পড়তেন, এবং লেখা ছাড়াও ছবি আঁকতেন। তাঁর আঁকা কিছু ছবি বেলভ্যূ-র ফ্ল্যাটে আছে। 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) এবং 'দুইতীর' (১৯৬৫)---তিনটি বইয়েরই প্রচ্ছদ লেখকের নিজের আঁকা। কাঠের কাজেও নিপুণ ছিলেন; নিজের ব্যবহারের জন্য অনেক আসবাবপত্র নিজেই তৈরি করেছেন। পারিতে দশ বছর বাস, ফরাসি স্ত্রী, ইয়োরোপীয় জীবনযাপন মুখ্যত পশ্চিমী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ চর্চা, ইংরেজিতে সরকারি বেসরকারি চিঠিপত্র - প্রতিবেদন ইত্যাদি লেখা সত্ত্বেও তাঁর মন বেশির ভাগ সময় নদীনালা, সুপারি - নারকেল, ধানক্ষেতের স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের জন্য ব্যাকুল বোধ করত।

পারি থেকে ফিরে মেলবোর্ন থেকে চিঠি লিখি শামসুর রহমান প্রমুখ কয়েকজন বন্ধুর কাছে ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন - সংক্রান্ততথ্য ও উৎসাদির খোঁজ করে। যেটুকু অল্পস্বল্প খবর পাই তার ভিত্তিতে তাঁর তিনটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত করে ইংরেজিতে একটি খসড়া আকারের প্রবন্ধ পাঠ করি বিদেশি সাহিত্যিকদের একটি বৈঠকে; পরে কলকাতায় তাঁর বিষয়ে দু'একটি অনুষ্ঠানে বলি। কিন্তু তখনো মনে হয়েছিল, এবং মকসুদ সাহেবের অধ্যবসায়ী ও মূল্যবান গ্রন্থটি পড়বার পরও মনে হয়েছে তাঁর সম্পর্কে প্রামানিক কিছু লেখবার জন্য যেসব তথ্য এবং উৎস অবশ্য প্রয়োজন (চিঠিপত্র, রোজনামচা,

বিভিন্ন লেখার প্রাথমিক খসড়া) তা এখনো সংগৃহীত হয়নি। সৈয়দ আবুল মকসুদ অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ। তবু যে এই আলোচনাটি লিখছি তার প্রথম উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যানুরাগীদের মনে ওয়ালীউল্লাহ্-র রচনাবলি বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তোলা যাতে কোনো উদ্যোগী প্রকাশক ঐ রচনাবলি সংগ্রহ করে কলকাতা থেকে তার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বার করেন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বিলম্বে হলেও তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির প্রতি প্রকাশ্যে লিখিতভাবে বাংলায় আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের প্রথম পর্ব বিষয়ে মকসুদ সাহেবের বই এবং অন্যান্য সূত্র থেকে মোটামুটিভাবে একটু জানা যায় ১৯২২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের এক শহরতলিতে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আহমদউল্লাহ্, মার নাম নাসিম আর খাতুন। মা ও বাবা দুজনেই বিত্তবান ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান। মা অল্পবয়সে মারা যান (১৯৩০), বাবা আবার বিয়ে করেন। বাবা সরকারি চাকরি করতেন। তাঁকে পূর্ব বাংলার নানা জায়গায় প্রশাসনিক কাজে যেতে হত; কৈশোর কালে ওয়ালীউল্লাহ্ তাই বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনো করেন। ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। বি.এ পাশ করেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩। তারপর কলকাতা আসেন এবং অর্থনীতি নিয়ে এম. এতে ভর্তি হন। কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করেননি, পরীক্ষাও দেননি। ১৯৪৫ -এ স্টেট্‌সম্যান দৈনিক পত্রিকায় যোগ দেন এবং দেশবিভাগ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। তারপর রেডিও পাকিস্তানে যোগ দিলে প্রথমে ঢাকা, পরে করাচি। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান্ দূতাবাসে বিভিন্ন পদে কাজের কথা অ্যান - মারির কাছে আগেই শুনেছিলাম।

কলকাতায় যে চার বছর ছিলেন সেই সময়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল' ও 'পূর্বাশা' সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয়। পূর্বাশা লিমিটেড থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। 'সওগাতে' প্রকাশিত বাইশটি, মাসিক মোহাম্মনীতে প্রকাশিত পাঁচটি এবং দ্বিমাসিক 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার তালিকা দিয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ তাঁর বইটিতে; এদের ভিতরে অগ্রন্থিত অনেকগুলি লেখা মকসুদ তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সম্ভবত কলকাতায় থাকাকালেই খসড়া আকারে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' লেখা শু হয়; এটি শেষ করেন ঢাকায় এবং সেখান থেকেই লেখকের খরচায় প্রকাশিত হয়। মকসুদ জানিয়েছেন যে 'প্রথম সংস্করণ বিশ - পঞ্চাশ কপি বিক্রি হয়ে থাকতে পারে, অবশিষ্ট সমুদয় কপি সের দরে ওজন করে বেচে দেয় বাঁধাইখানার লোকজন।' ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় এবং পরের বছর ওয়ালীউল্লাহ্ এই বইয়ের জন্য বাংলা একাডেমি থেকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে পুরস্কৃত হন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' নিয়ে গোড়াতে আলোচনা করেছি। তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' বেরোয় ১৯৬৮ সালে। তাছাড়া ১৯৬০ সালে তাঁর নাটক 'রহিনী, ১৯৬৪ সালে তাঁর নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' ও একটি 'কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা' নাটিকা 'রহিনী, 'সুড়ঙ্গ', এবং ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুই তীর' প্রকাশিত হয়। (এই গল্পসংগ্রহটির নাম ওয়ালীউল্লাহ্ দেন 'স্তন', কিন্তু সম্ভাব্য ত্রেতা, কী মহিলা, কী পুষ, ঐ নাম ধরে বই চাইতে লজ্জা পাবে আশঙ্কা করে প্রকাশক লেখকের সম্মতি নিয়ে বইটির নাম পালটে দেন।) এই বইগুলি, মকসুদের বইয়ের দুইখণ্ডে অর্ন্তভুক্ত কবিতা - ছোটগল্প - চিত্রসমালোচনা - পত্রগুচ্ছ ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু এতাবৎ অগ্রন্থিত কিছু বাংলা লেখা ছাড়াও তিনি ইংরেজিতে তিনটি বই লিখেছিলেন --- এগুলি এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত। এদের ভিতরে আছে 'চাঁদের অমাবস্যা'র একটি ইংরেজি অনুবাদ; নাম ' No Amaranth.'

যদিও স্বভাবের দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্ সামাজিক ছিলেন না, কলকাতায় থাকবার সময়ে বেশ কয়েকজন ভাবুক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছিল। সম্ভবত এই সময়েই ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে তাঁর মনের মুক্তি ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল ওদুদ ও আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু, শাহেদ সুহরাওয়ার্দী, গোপাল হালদার, শওকত ওসমান, গোলামকব্দুস প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে তাঁর কম - বেশি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না হয়ে থাকলেও পরে শুনেছি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ঐ সময়ে তাঁর ভাবনার আদান হয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক দলের তিনি কখনো সদস্য হননি, কিন্তু তাঁর প্রতিন্যাস ছিল যুক্তিবাদী ও সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। সুহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর প্রস্তাবিত 'স্বাধীন সংযুক্ত বাংলা' গঠনের দাবি যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি একই সঙ্গে বাংলাকে ভালোবাসতেন এবং সংস্কৃতির দিক থেকে ছিলেন বিশ্বনাগরিক। বিশের দশকের

শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ায় ঢাকায় অধ্যাপক আবুল হুসেনের নেতৃত্বে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়েউঠেছিল সৃজনধর্মী সাহিত্যে তারই উত্তরাধিকারকে ফলপ্রসূ করেছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। আমার ধারণা সমকালীন বাংলাদেশের সাহিত্যমানস গড়ে তোলায় তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

।। চার ।।

'চাঁদের অমাবস্যা' যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম, তাঁর অন্য দুটি উপন্যাসে এবং কিছু ছোটো গল্পে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মোটেই অপ্রত্যক্ষ নয়। প্রথম সংস্করণে 'লালুসালু'র পাঠক জোটেনি; কিন্তু পরে এটির অনেকবার মুদ্রণ হয়েছে। উর্দু, ইংরেজি ও ফরাসি ছাড়াও চেক এবং সম্ভবত আরো কয়েকটি পূর্ব ইয়োরোপীয় ভাষায় এই উপন্যাসটির অনুবাদ ছাপা হয়। ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে মূলের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা যায়; বাংলা সংস্করণে (অষ্টম মুদ্রণ জুলাই, ১৯৭৩) যেখানে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৬, ফরাসি অনুবাদের সংস্করণে সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০, এবং ইংরেজি অনুবাদে পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ মূল বাংলা সংস্করণ এবং ইংরেজি অনুবাদ সংস্করণের পার্থক্য নিয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ১১১-১৫০) আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে যদিও অনুবাদক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাম ইংরেজি ও ফরাসি সংস্করণে উল্লেখিত হয়নি, এইসব ঘসামাজা বাড়ানো বদলানো লেখক নিজেই করেছিলেন; এ কাজ অনুবাদকের সাধ্যায়ত্ত নয়। মকসুদের এই সিদ্ধান্ত সংগত বলেই মনে হয়।

'লালসালু' মজিদ ও মহববতনগর গ্রামের কাহিনি। মজিদ 'খোদার আলো ছড়াতে' এবং ভাগ্য ফেরার আশায় গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কিছুকাল কাটিয়েছিল। সুবিধা করতে না পারায় তিনদিনের পথ হেঁটে সে মহববতপুর গ্রামে পৌঁছয়। সেখানে একটা বড় বাঁশঝাড়ের কাছে মজা পুকুরের পাশে পুরোনো একধারে টালখাওয়া কালো সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা ছোট ছোট ইটের তৈরি একটা কবর দেখে সে একটা মতলব ঠাওরায়। সে ঘোষণা করে 'ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার'। গ্রামবাসীদের ধমকে, অলৌকিক শক্তির ভয় দেখিয়ে, তাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, দুর্বলতা, আত্মনির্ভরতার অভাব এবং পরিবেশের বিমুখতার সুযোগ নিয়ে মজিদ ক্রমে নিজেকে ঐ গ্রামের একচ্ছত্র ধর্মীয় নেতার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী জোতদার খালেক ব্যাপারীও ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে মজিদের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং দুজনের ভিতরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মজিদ জানে তার প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস সেই কবর যেটা কার কবর সে জানে না, কিন্তু যেটাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে ধর্মভী গ্রামবাসীদের সে বিশ্বাস করিয়েছে। ইট সুরকি দিয়ে নতুন করা হয় মাজারকে, তার ওপরে ঝালরয়ালা লালসালু পড়ে দেখায় মাছের পিঠের মতো, মোমবাতি জ্বলে, আগরবাতি গন্ধ ছড়ায়, এ গ্রাম থেকে লোকেরা এসে তাদের কান্না, কৃতজ্ঞতা, আশা, ব্যর্থতার কথা নিবেদন করে, আর সঙ্গে ছড়াছড়ি যায় পয়সা, সিকি, দুয়ানি আধুলি, সাচচা টাকা, নকল টাকা।

মজিদের ঘরবাড়ি ওঠে, এক 'ব্যপ্তযৌবনা' শক্তসমর্থ মেয়েকে 'আলিঝালি' দূর থেকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে শীর্ণদেহ মজিদ তাকে বিয়ে করে; পরে বুঝাতে পারে যে রহিমা ভারি 'ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ', রোগা বুড়োটে মজিদের 'পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে' মজিদকে যেমন সে ভয় তেমনি শ্রদ্ধা করে। গান, হাসি, আনন্দ, উৎসব, এসবের মজিদ একেবারে বিরোধী। বয়স্ক জোয়ানদের ধমকে কলমা পড়ায়; এক বাপ - বেটাকে জবরদস্তি পাকড়াও করে হাটবাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে খৎনা দেয়; জমায়েত ডেকে এক বদমেজাজি বুড়োকে খোদার নামে এমনভাবে তার মনের মেদণ্ড ভেঙে দেয় যে সে চিরকালের মতো ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। মজিদের ঘরে মগড়ার পর মগড়া উপছে পড়ে ধানের প্রাচুর্যে। মজিদ অনুভব করে তার শক্তি খালেক ব্যাপারীর শক্তি থেকে ভিন্ন জাতের। 'মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির সূত্র।'

মজিদের এই একচ্ছত্র ক্ষমতায় প্রথম ধাক্কা লাগে তিনগ্রাম পরে এক পীর সাহেবের আগমনের ফলে। লোকজন পীরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে 'একটা মারাত্মক ক্রোধ - ঘৃণা মজিদের রক্তে টগবগ করতে থাকে।' তারপর মজিদ মাথা ঠাণ্ডা করে পীরের ধাপ্পাবাজি ধরিয়ে দেবার মতলব আঁটে। তার চেষ্টা অংশত সফল হয়; তার গ্রামের কিছু যুবক 'জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে' পীর সাহেবের সভায় গিয়ে হামলা করে। কিন্তু সংখ্যায় কম বলে তাদেরই মাথা ফাটে, তাদেরই হাসপাতালে যেতে হয়। তারপর মজিদ দেখে খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান প্রথম বিবি আমেনা সন্তান কামনায় পীরের থেকেই পা

নিপড়া চায়। মজিদ তখন বিস্তর মাথা খাটিয়ে নানা কাল্পনিক তত্ত্বের উদ্ভাবনা ও অনুষ্ঠানবিধির ব্যবস্থা করে ব্যাপারীকে বোঝায় যে আমেনা বিবির গুণাগার দিল থেকে খালেকের পাক দিল বিচ্ছিন্ন না করতে পারলে খালেকের অশেষ শাস্তি সুনিশ্চিত। 'খোদার কালামের সাহায্যেই' মজিদ একথা জেনেছে। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপারী তার নিরপরাধ 'ধর্মভী ও স্বামীভী' বিবিকে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

বিদেশ - প্রত্যাগত 'উচক্কা ধরনের ছেলে' যুবক আববাসের স্কুল খোলার প্রস্তাবকে কৌশলে বানচাল করে দিয়ে মজিদ তার জায়গায় গ্রামে এক পাক গম্বুজওলা মসজিদ তৈরি করায়। কিন্তু চিত্তপ্রতিপত্তি খোদার কালাম সত্ত্বেও মজিদের মনে শান্তি নেই। তার কোনো পোলাপাইন নেই এবং ঠাণ্ডা, ভীতু রহীমাকে নিয়ে তার দেহের কামনা মেটেনি। গ্রাম্য - ক্ষমতার চূড়ায় বসে মজিদ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। জমিলাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল 'সে যেন ঠিক বেড়ালছানা'। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই বোঝা যায় কিশোরী জমিলার প্রকৃতি রহীমার একেবারে বিপরীত। সে যখন তখন জোরে হেসে ওঠে; দুঃখীর দুঃখে তার মনে 'কুলকিনারাহীন অথই প্রশ্ন' জাগে; নামাজ পড়তে ভুলে যায়; মজিদের ধমকধামক গ্রাহ্য করে না; এমনকি যখন মগরেবের পরে দোয়াদদ পাটের শেষে জিকির করতে করতে মজিদ উদ্বেল জমায়েতের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন বিভ্রান্ত জমিল সব রীতিনিষেধ ভুলে বাইরে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে --তার মাথায় ঘোমটা নেই। মজিদের জ্ঞান ফেরে, কিন্তু জিকির আর জমে না। পরদিন মজিদ পীরের মাজার সম্পর্কে জমিলাকে অনেক বানোয়াট ভয়ঙ্কর গল্প বলে; তাকে হুকুম দেয় রাতের নামাজ পড়ে পীরের কাছে মাফ চাইতে। কিন্তু রাতে খুঁজতে এসে দেখে জমিলাজায়ানামাজে ঘুমিয়ে আছে। তাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে মজিদ মাজারের দিকে নিয়ে যায়। মাঝপথে জমিলা বেঁকে বসে, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে---"হঠাৎ সিধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিক করে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করলো।" স্তম্ভিত মজিদ সন্ত্রস্তরহীমার দিকে চেয়ে 'অদ্ভুত গলায় বললো হে আমার মুখে থুতু দিলো!'

কিন্তু একে উদ্যোগী, শক্তিমান, মাতববর পুষ, তার খোদার কালামের সহায়তায় প্রায় সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, কিশোরী বউয়ের বিদ্রোহে ঘাবড়াবার লোক মজিদ নয়। তাকে পাঁজাকোলে করে মাজারে নিয়ে যায় সেখানে একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে জমিলার কোমর বাঁধে, তারপর মাজার - ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে নিজের বাড়িতে চলে আসে। সে রাতে ভয়ঙ্কর ঝড় ওঠে, তারপর অজস্র শিলাবৃষ্টি। রহীমা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, মজিদ ছটফট করে; শিলাবৃষ্টি থামতেই মাজারে যেয়ে ঝাঁপটা খুলে দেখে লালসালু ঢাকা কবরের পাশে 'হাত - পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই।' মজিদা দড়ি খুলে তার অচেতন দেহ তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। 'মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন ওলটপালট হয়ে যাবার উপত্রম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।' মাঠে বেরিয়ে দেখে 'ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে পড়া ধানের ধবংসস্তূপ।....চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।'

'চাঁদের অমাবস্যা'র মতো 'লালসালু'র শৈলী অতটা সূক্ষ্ম নয়; ব্যঞ্জনাশ্রিত আভাসের চাইতে বিশ্লেষধর্মী প্রতিন্যাসের স্পষ্টতা এই উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু দুই উপন্যাসেই গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও অশিথিল একাগ্রতায় ধীরে ধীরে প্রধান চরিত্র দুটি প্রমিতাক্ষরিত। 'চাঁদের অমাবস্যা'য় বস্তুত কোনো স্ত্রী চরিত্র নেই; 'লালসালুতে শুধু বিদ্রোহিনী জামিলা নয়, সন্ত্রস্ত সেবাব্রতী ও স্নেহপরায়ণ রহীমা, স্বামীভী আমেনা, বিধবা ধানভাননী হাসুনির মা ('শরীলে যার রং ধরেছে) এবং তার ঝগড়াটে 'ছোটখাটো, কোঁকড়ানো' মাবুড়ী প্রত্যেকেই জীবন্ত। তাছাড়া এ উপন্যাসটিতে মাজার - পীরমোল্লাশাসিত মুসলমান গ্রাম সমাজের পরিচয় মেলে। জীবনের অনিশ্চয়তাজাত ভয় এবং অলৌকিকে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বিত্তসম্বলহীন কিন্তু অভিনয়দক্ষ ও চতুর উদ্যোগীজন যে কীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, খোদার কালাম যে তার ব্যবসায়ে কতবড় পুঁজি হয়ে উঠতে পারে, বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র আগে আর কেউ কাহিনির ভিতর দিয়ে এত অনাবিদ্ধ দুঃসাহসে সেটি ফুটিয়ে তুলেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 'অহিংসা' উপন্যাসের (১৯৪১) উৎকর্ষ লক্ষ করবার পরও আমার মনে হয় 'লালসালু'র ধীপ্রদীপ্ত, অনন্যতন্ত্র সাহসিকতার তুলনা সেখানেও মেলে না। আসলে হিন্দু আশ্রমগুদের চরিত্র বিশ্লেষণের চাইতে মুসলিম পীরমোল্লাদের চরিত্র বিশ্লেষণ যে - কোনো বাঙালি লেখকের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক। শুধু সার্থক উপন্যাস হিসেবে নয়, শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের সমকালীন মানস মুক্তির প্রচেষ্টার ইতিহাসেও 'লালসালু' বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস 'কাঁদো নদী কাঁদো' তাঁর প্রথম উপন্যাস দুটির চাইতে গঠনের দিক থেকে

জটিলতর, বক্তব্যের দিক থেকে আরো গূঢ় এবং কিছুটা অস্বচ্ছ। এটিতে একটিতে আছে নিপুণ বিশৃঙ্খলায় কথিত মুহম্মদ মুস্তাফার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনি, অন্যদিকে কুমুরডাঙ্গার অবক্ষয়ের বিবরণ। কতক তবারক ভুইঞার জবান অনুসারে 'পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিনকাটিয়েছি, নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠে নি। বালক বয়সে মুহাম্মদ মুস্তাফার প্রথম বীর্যস্থলনের রাতে তার নির্দয় পিতাতাকে প্রচণ্ড প্রহার করেছিল; অনতিক্রমনীয় আতঙ্ক মুস্তাফার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত; সে সইতে শিখেছে, করতে শেখেনি; শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যাও করে। কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে মুস্তাফার সম্পর্ক এই দেশের বাড়িতে ফিরে আত্মঘাতী হবার আগে সে কুমারডাঙ্গার সঙ্গে মুস্তাফার সম্পর্ক স্টিমার আসা বন্ধ হয়ে যায়। কুমারডাঙ্গার লোকদের মনেও কী একটা সদাজাগ্রত ভয়। যেন খোদাকে নয় খোদার সৃষ্টিকে তাদের ভয়। দোজখকে নয় নশ্বর জীবনকে তার ভয়'। 'সর্বপ্রকার মহিবতের জন্য তারা সদা তৈরি, এবং একবার কোনো মহিবত এলে তার অস্তিত্ব বা ন্যায্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না।' স্টিমার চলাচল বন্ধ হবার পর মোত্তারের মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী সখিনা খাতুন 'একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়।' 'কান্নাটি কোনো মানুষের নয়, কোনো জীবজন্তুর, জীবিতের নয়, মৃতেরও নয়, অন্য কারো। কে জানে, কান্নাটি হয়তো নদীরই, হয়তো তাদের মরণোন্মুখ বাকাল নদীই কাঁদে।' ক্রমে কুমারডাঙ্গার আরো অনেকে এই রহস্যময় কান্না শুনতে পায়। তারা তখন সব কিছুতেই আসন্ন ভীষণ বিপদের পূর্বচিহ্ দেখতে পায়, তাদের জীবন হয়ে দাঁড়ায় শ্বাসরুদ্ধকরা অপেক্ষা মাত্র'। কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।'

মুস্তাফা ও কুমুরডাঙ্গা দু'এর কাহিনিই আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু এই উপন্যাস যে কাহিনিমাত্র নয়, সূচনা থেকেই তা স্পষ্ট। এখানে ব্যক্তিগত ও সামূহিক মর্তুকাম বৃত্তির সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক পরিপেক্ষণ পদে পদে আমাদের ভাবায়, আমাদের ভোগবৃত্ত পঠনকে নানা প্রশ্নের দ্বারা উদ্দীপিত করে। কুমুরডাঙ্গা কি তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু পূর্ববাংলার প্রতীক, অথবা আধুনিক সভ্যতার মৃত্যুমুখিনতার অথবা মানুষের অস্তিত্বক অর্থহীনতার? মনে হয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি পাওয়া গেলে এই উপন্যাসটির নিগূঢ়ার্থ স্পষ্টতর হতে পারে।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক ছোটগল্প নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। বস্তুত এ লেখাটি প্রস্তাবনা মাত্র। তাঁর 'বহিপীর' নাটকেরঅভিনয় আমি দেখেছি, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর কৃতি যেমন অসামান্য নাট্যকার হিসেবে তেমন উল্লেখ্য বলে আমার অন্তত মনে হয়নি। অপরপক্ষে তাঁর বেশ কয়েকটি ছোট গল্প বিস্তারিত আলোচনা দাবি করে। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, অন্তর্মুখভাবনা ও ইঙ্গিতঋদ্ধ কল্পনা দুর্লভ সংযুক্তি রচনা করেছে। সৌভাগ্যবশত 'নয়নচারা' ও 'দুইতীর' -- এর একটি গল্প সংকলন কলকাতায় খোঁজ করলে পাওয়া যায়; শুকসারী নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৭১ সালে এই 'গল্পসমগ্র' প্রকাশ করেছিল।

সব মিলিয়ে আমার সন্দেহ নেই ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা ভাষায় আমাদের সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। যে সময় পশ্চিম বাংলায় বাজারি অভিযাচনার চাপে উপন্যাস মননবিমুখ ফচকেমি, ন্যাকামি আর গালগল্পে পর্যবসিত হতে চলেছে সে - সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিবেকী শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় হয়তো এখানকার কিছু লেখক ও পাঠকের মনে বাংলা উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি ও সামর্থ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com